কাদিয়ানী রক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষদের জান কুরবান ও সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গ

"প্রয়োজনে জীবন দিতে হলে দেবো, লাশ হয়ে যেতে হলে যাবো, তবু ২৭ আগস্ট আহমদীয়া মুসলিম জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উগ্র মৌলবাদীদের হামলার যে কোন প্রচেষ্টা রুখে দেবো।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, খতমে নবুয়ত নামক সংগঠন-এর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে আগামী ২৭ আগস্ট ঢাকার বকশী বাজারস্থ আহমদীয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয় অবরোধের যে ঘোষণা দেয়া হয়, সেটাকে প্রতিহত করার লক্ষ্যে উগ্র ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের সংগঠন 'মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী দক্ষিণ এশীয় গণসম্মিলন' জাতীয় প্রেসক্লাবে এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে এবং সেখানেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা প্রদান করেন উপরোক্ত ত্যাজোদীপ্ত ঘোষণা।

হারুনুর রশীদ

এই বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন উক্ত গণসম্মিলনের সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার কবীর। এই গোলটেবিল বৈঠকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা ঘোষণা করেন যে ওই দিন (২৭ আগস্ট) তারা বকশীবাজারস্থ কাদিয়ানীদের প্রধান কার্যালয় ঘিরে রাখবেন যাতে খতমে নবুয়তের লোকেরা বা অন্য কোন মুসলিম সংগঠনের সদস্যরা উক্ত কার্যালয়ের ধারে কাছেও ঘেঁষতে সমর্থ না হয়। তারা আরও হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন যে, 'মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা কোন ধরনের হামলা, লাঞ্ছনা বা নির্যাতন চালালে তার দায়দায়িত্ব জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও তার সরকারকেই বহন করতে হবে। তারা "দীর্ঘদিন ধরে বাড়তে থাকা" মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলারও দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করেন।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত গোলটেবিল বৈঠকে বক্তব্য দেন বিচারপতি কে এম সোবহান, অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরী, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সাংবাদিক কে জি মুস্তফা, হাবিবুর রহমান মিলন, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক, আদিবাসী নেতা সঞ্জীব দ্রং, সঙ্গীত শিল্পী কলিম শরাফী প্রমুখ। এছাড়াও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বা উপস্থিত ছিলেন আহমদীয়া জামাতের আমীর অধ্যাপক মীর মোবাশ্বের আলী, মানবাধিকার নেতা রোজালিন ডি. কোস্টা, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সেক্টর কমান্ডার কর্নেল (অবঃ) আবু ওসমান চৌধুরী, ভাস্কর ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিণী, লেখক-কলামিস্ট দৌলতারা মান্নান, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism-এর অর্থ হচ্ছে ধর্মহীনতা বা ধর্মদ্রোহিতা। যেমন Random House Dictionary of the English Language-এ ধর্মনিরপেক্ষতা বা Secularism-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে Not belonging to a religious order (যা কোন ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্গত নয়), Rejects all forms of religious faith (যা সকল ধর্ম বিশ্বাসকে অস্বীকার করে) ইত্যাদি। বলাবাহুল্য, ধর্মনিরপেক্ষতা (Secularism) এবং অসাম্প্রদায়িকতা (Non-communalism) সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তো দাবী করেন যে তারা ধর্মনিরপেক্ষ, অর্থাৎ কোন ধর্মের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই অথবা তারা সকল ধর্মেরই বিরোধী। সেখানে হঠাৎ তারা কাদিয়ানীদের জন্য প্রয়োজনে লাশ হয়ে যাওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ঘোষণা করছেন কেন? তাহলে কি ব্যাপারটা এই যে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আসলে কাদিয়ানী মতবাদেরই ঘোরতর সমর্থক? নাকি ব্যাপারটা এরকম যে, ইসলাম বা মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের ওপর যে বা যারাই আঘাত হানবে, তাকে বা তাদের সঙ্গে পরম একাত্মতা ঘোষণা করবেন বলেই তারা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ? নাকি উভয়টিই? ওয়াকেবহাল মহলই ভালো বলতে পারবেন।

ঘটনা প্রবাহ থেকে এটা দিবালোকের মতোই সুস্পষ্ট যে, যদিও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বা স্যাকুলারিস্টদের সকল ধর্মেরই বিরোধিতা করার কথা, বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা কিন্তু তা করেন না। তাদের কথাবার্তা ও আচরণ থেকে এটাই পরিস্ফুট যে, খেয়ে না খেয়ে নখেদন্তে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরোধিতা করাটাই হলো তাদের বিচারে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতা। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের শতকরা ৯০ জনের জন্মই মুসলিম পরিবারে হলেও এবং তাদের স্ব-স্ব নামও মুসলমানী নাম হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্য সকল ধর্মেরই খুবই গোড়া সমর্থক, বিশেষতঃ কোটি দেবদেবী অধ্যুষিত ও উদার যৌনতার ঐতিহ্য সম্পন্ন হিন্দুধর্ম ও ইহুদী ধর্মের ব্যাপারে তারা একেবারেই ফানাদিওয়ানা। সম্প্রতি তাদের প্রেম ফেটে পড়ছে কাদিয়ানীদের জন্যও, যেই মতবাদের গুরু গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ঘোষণা করেছেন যে, মুহাম্মদ (সাঃ) শেষ নবী নন এবং তিনি নিজেও একজন নবী।

এটা ঠিক যে সুন্নী ও শিয়া এই দুই প্রধান ঘরানা ব্যতীতও মুসলমানদের মধ্যে ছোট-বড় আরও কয়েক শত ঘরানা আছে। কিন্তু শিয়া-সুন্নী ও ঘরানা নির্বিশেষে এদের সকলেই সম্পূর্ণ একমত যে কাদিয়ানীরা কোনক্রমেই মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নন। এ ব্যাপারে দলমত ফিরকাহ নির্বিশেষে মুসলিম জুরিগণ ও আলেমদের মধ্যে কোনই মতভেদ নেই। অথচ বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা সকল মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক অমুসলমান ঘোষিত এই কাদিয়ানীদের জন্যই প্রাণ বিসর্জন দেবেন বলে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। তাদের এহেন কাদিয়ানী প্রেমেরইবা ব্যাখ্যা কি?

বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যে এখন কাদিয়ানী প্রেমে মশগুল, এটা বোধ করি শুধুমাত্র ধর্মীয় ব্যাপার নয়, রাজনৈতিক ব্যাপারও বটে। সকলেই জানেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের, বিশেষতঃ ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের সকলেই বিনা ব্যতিক্রমে আওয়ামী লীগেরই একদম অন্ধ সমর্থক ও অ্যাক্টিভিস্ট এবং শেখ মুজিবুর রহমান ও শেখ হাসিনার প্রতিই তাদের অচলা ভক্তি হিন্দু সম্প্রদায়ের মহাদেব বা দুর্গা ভক্তির চেয়েও অনেক বেশী গভীর, প্রখর ও মারমুখী। অপরদিকে, আওয়ামী লীগ ও তার নেত্রী শেখ হাসিনাও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের খুবই ভক্ত-অনুরক্ত বলেই প্রতীয়মান হয়। শেখ হাসিনা মাঝে মাঝে হজ্ব, উমরাহ হজ্ব, মাযার জিয়ারত ইত্যাদি করলেও আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক প্রমুখতো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের একদম সামনের কাতারের সেনাপতি।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা যে ২৭ আগস্ট কাদিয়ানীদের রক্ষা করার জন্য জান কুরবান করবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছেন, এর পেছনে তাহলে সাহসের উৎস কি আওয়ামী লীগের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা? আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব যদি কাদিয়ানীদের রক্ষায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ঘোষিত ক্রুসেডকে প্রকাশ্যে অস্বীকার না করেন, তাহলে কি এটাই প্রমাণিত হবে না যে আওয়ামী লীগরাও প্রচ্ছন্নভাবে এটাই চান যে ইসলামের মূলধারার সম্পূর্ণ পরিপন্থী বিধায় কাদিয়ানীরাও বাংলাদেশে প্রবলভাবে টিকে থাকুক এবং দেশের ৯৯.৯% মুসলমানের ঈমান ও আক্বিদার ওপর হেনে যেতে থাকুক আঘাতের পর আঘাত। ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের কাদিয়ানীরক্ষা এজেন্ডার ব্যাপারে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগারদের ভূমিকা ও প্রতিক্রিয়া কি, তা দেশবাসীর সবারই খুবই জানতে ইচ্ছে করে? তারা কি এ ব্যাপারে নীরব থেকেই পরোক্ষ সমর্থন দেওয়ার নীতিতেই অটল থাকবেন?

লক্ষণীয়, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এখন অত্যন্ত স্পর্ধা ও মারমুখিতার সঙ্গেই ইসলামপন্থীদের (তাদের ভাষায় মৌলবাদীদের) নির্মূল করে দেওয়ার অঙ্গীকার ঘোষণা করে আসছেন। বাংলাদেশে যেখানে যখন যে অঘটনই ঘটুক না কেন, সঙ্গে সঙ্গেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তার জন্য ইসলামপন্থীদের দোষী সাব্যস্ত করে দিচ্ছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বয়ং শেখ হাসিনাসহ আওয়ামী লীগ নেতারাও প্রতিটি অঘটনের জন্য ইসলামপন্থী ও বিএনপিকে (বিশেষতঃ প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াকেই) দোষী বলে রায় ঘোষণা করে দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে কখনোই কোন ব্যতিক্রম ঘটছে না।

গত কিছুদিন যাবৎ বাংলাদেশে বেশকিছু বোমাবাজি ও গ্রেনেড বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এর প্রকোপ সবচেয়ে বেশী দেখা গিয়েছে সিলেটে। সেখানে জুম্মার নামাজ শেষে হযরত শাহ জালাল (রঃ) মাজার সংলগ্ন মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসার সময় গ্রেনেড হামলা হয়েছে খোদ বৃটিশ হাই কমিশনার আনোয়ার চৌধুরীর ওপর। কিন্তু ঘটনার পর তিন মাসেরও বেশী সময় অতিবাহিত হয়ে গেলেও কারা কি উদ্দেশ্যে বৃটিশ হাই কমিশনারকে হত্যা করতে চেয়েছিলো সে রহস্য উদঘাটিত হয়নি। সর্বশেষ ঘটনা ঘটেছে গত ২১ আগস্ট বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে আওয়ামী লীগের জনসভায়। এই জনসভায় কমপক্ষে ৭টি বিদেশে তৈরী সামরিক গ্রেনেড

বিস্ফোরিত হয়। সম্ভবতঃ গুলীও চলে। ফলে এই প্রতিবেদন লেখার দিন (২৩-৮-২০০৪) পর্যন্ত এই গ্রেনেড হামলায় নিহতের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯। আহতের সংখ্যা তিন শতাধিক। এই হামলায় আওয়ামী লীগ নেত্রী আইভি রহমানের দু'টি পা-ই ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে হাসপাতালে উভয় পা-ই হাঁটুর কাছ থেকে কেটে ফেলে দিতে হয়। পরে তিনি মারা যান।

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অবশ্য হাসপাতালে মুমূর্ষু আইভি রহমানকে দেখতে গিয়েছিলেন। তিনি সুধাসদনে গিয়ে শেখ হাসিনার সঙ্গেও দেখা করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ যাবৎ শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে কোনই সাড়া দেওয়া হয়নি। তিনি এই গ্রেনেড হামলার ব্যাপারে তীব্র ক্ষোভও প্রকাশ করেছেন। ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিএনপির অন্যান্য নেতাও। কিন্তু ক্ষোভ প্রকাশই যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন হচ্ছে, তারা এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য উন্মোচন করবেন কিনা। নাকি, এই ঘটনাও আনোয়ার চৌধুরীর ওপর হামলার ঘটনাসহ অন্যান্য ঘটনার মতোই ধামাচাপা পড়ে যাবে? যদি তাই-ই হয়, তাহলে দেশ-বিদেশে মানুষ, বিশেষতঃ বিভিন্ন দাতাদেশ ও গোষ্ঠী, জাতিসংঘের বিভিন্ন শাখা এবং অ্যামনেস্টি ও ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থাতো একথা ভাবতেই পারে যে বোমা ও গ্রেনেড হামলার এসব ঘটনার পেছনে জোট সরকারের অন্ততঃ পরোক্ষ সমর্থন হলেও আছে– নইলে একের পর এক ঘটনা ঘটছে– অথচ কোন ঘটনারই রহস্য উন্মোচিত হচ্ছে না কেন?

কথায় আছে একটা নিরীহ বেড়ালের ওপরও যদি পুনপৌনিক হামলা চালানো হয় এবং বেড়াল যদি অনুভব করে যে তার বাঁচার আর কোন পথই খোলা নেই, তখন সেও আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে হামলাকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং বসিয়ে দিতে চেষ্টা করে মরণ কামড়। বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা, তাদের রাজনৈতিক মুরব্বীরা এবং আন্তর্জাতিক গডফাদাররা বাংলাদেশের ইসলামপন্থীদের সেই বেড়ালের অবস্থাতেই ফেলে দিচ্ছেন নাতো? যেই-ই ইসলামের কথা বলছে বা ইসলামী বিধি-বিধান কায়েমের কথা বলছে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাকেই ঢালাওভাবে 'তালেবান,' 'আল কায়েদা' ইত্যাদি বলে ব্র্যান্ড করে দিচ্ছেনই, দেশব্যাপী ইসলামী জঙ্গীরা অস্ত্র হাতে টহল দিচ্ছে, খাগড়াছড়ির গভীর জঙ্গল থেকে শুরু করে প্রতিটি মাদ্রাসায় জঙ্গী ইসলামপন্থীদের ট্রেনিং চলছে ইত্যাদি বলে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও তাদের দোসরদের প্ররোচিত করছেনই ইসলামপন্থীদের ওপর আফগানিস্তান বা ইরাকের মতো ভয়াবহ আঘাত হানার জন্য, প্রতিনিয়ত তারা হুমকি দিচ্ছেনই– মৌলবাদীদের (তাদের মতে ইসলামপন্থী মাত্রই মৌলবাদী) নির্মূল করে দেবেন বলে। এমনকি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান দল আওয়ামী লীগের নেতা-নেত্রীরাও সন্ত্রাসমূলক প্রতিটি ঘটনার জন্য তথাকথিত মৌলবাদীদের দায়ী করে তাদের ওপর আঘাত হানার ক্ষেত্র প্রস্তুত করছেনই এবং আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল ও অন্যরা তো নাকি এমনও বলছেন যে, তারা একবার ক্ষমতা যেতে পারলেই এসব মৌলবাদীদের দেখে নেবেন। এমতাবস্থায়, কোন ইসলামপন্থী যদি মনে করেন যে এরা তো যে কোন সময় ইসলামপন্থীদের খতম করে দেওয়ার জন্য মারণ আঘাত হানবেই। অতএব আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টা হিসাবে এই আঁততায়ীদের ওপর আঘাত হেনে দেখা যাবে। তাহলে তাদের খুব বেশী একটা দোষ দেওয়া যাবে কি? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা তাদের রাজনৈতিক মুরব্বী ও আন্তর্জাতিক গডফাদারদের সহায়তায় ইসলামপন্থীদের নির্মূল করার জোর প্রস্তুতি নিচ্ছেন, এমতাবস্থায় ইসলামপন্থীদের কি আচরণ করা স্বাভাবিক ও উচিত বলে তারা বিবেচনা করেন? বসে বসে মার খাওয়া ও মরে যাওয়া? ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা এই মুহূর্তেই ইসলামপন্থীদের ওপর মারণ আঘাত হানতে পারুন আর নাই-ই পারুন, এটাতো এখন সূর্যের উদয়-অস্তের মতোই অবধারিত যে, আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় যেতে পারলেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা, হয়তোবা খোদ আওয়ামী লীগ সরকারও দলমত ফিরকাহ নির্বিশেষে ইসলামপন্থীদের ওপরই মারণ আঘাত হানবেনই হানবেন।

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশে কি ঘটবে, কতো রক্তে রঞ্জিত হবে বাংলাদেশের মাটি, তা বোধ হয় কেউই হলফ করে বলতে পারেন না।

এই বিপদ মোকাবিলায় কি করবেন ইসলামপন্থীরা? ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়বেন? বিচ্ছিন্নভাবে মার খাবেন? নাকি সব কিছুই ভাগ্যের হাতেই ছেড়ে দেবেন? বলাবাহুল্য, আজই সেই ২৭ আগস্ট। খতমে নবুয়তের কাদিয়ানী সদর দফতর ঘেরাওয়ের এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের তা প্রতিরোধে প্রয়োজনে লাশ হবার দিন। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়িয়ে যায়।

রাজনীতিকরা যখন লেখক

স্টালিন সরকার

আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আত্মজীবনী লিখে সারা বিশ্বে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন। 'মাই লাইফ' নামের তার লেখা বইটির কয়েক লাখ কপি বিক্রি হয়েছে। এর আগে তার স্ত্রী হিলারী ক্লিনটনের লেখা বইও গোটা বিশ্বের পাঠক মহলে সাড়া ফেলে দিয়েছিল। বিশ্বের অনেক রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব রাজনীতির পাশাপাশি বই লিখে লেখক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। সার্কভুক্ত দেশগুলোতেও রয়েছেন অনেক রাজনীতিক যারা লেখক হিসেবে নিজেদের সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাংলাদেশেও এই ধরনের রাজনীতিকের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। রাজনীতিকদের এই লেখালেখির বাতিক কিছুটা হলেও দেশের শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। নেতারা নিজেদের অভিজ্ঞতার আলোকে রাজনীতি নিয়ে লেখালেখি করেছেন। পাঠক মহলে সেটা ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। অনেক রাজনীতিকের কাঁচা হাতের লেখা অবশ্য পাঠক মহলে সমালোচনারও জন্ম দিয়েছে। তারপরও রাজনীতিকদের মধ্যে লেখালেখির অভ্যাসের অনেকগুলো ইতিবাচক দিক রয়েছে। সাধারণ লেখকরা রাজনীতি নিয়ে লেখেন পড়াশোনা করে জেনেশুনে এবং তথ্য সংগ্রহ করে। কিন্তু রাজনীতিকরা লেখেন নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। যদিও অনেক রাজনীতিকের লেখা নিয়ে বিতর্ক আছে। নেতারা নিজেদের লেখায় সাহিত্য বা শিল্পমানের চেয়ে রাজনৈতিক স্লোগানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রতিপক্ষকে লেখনীর মাধ্যমে অযাচিতভাবে ঘায়েল করার চেষ্টা করছেন। আবার বলা হয় নেতারা নিজেদের খারাপ দিকগুলো আড়ালে রেখে শুধু ভাল দিকগুলো লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। অনেক নেতা আবার কাউকে বড় করা বা কাউকে ছোট করার জন্য কলম হাতে তুলে নেন। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের লেখা নিয়ে এই তর্ক-বিতর্ক থাকলেও পাঠক মহলে লেখাগুলো বেশ সমাদর পায়।

রাজনীতিকরা হচ্ছেন পাবলিক ফিগার। জনগণকে নিয়েই তাদের কাজ কারবার। তাই রাজনীতি সচেতন জনগণ রাজনীতিকদের লেখার প্রতি একটু বেশী ঝুঁকে পড়েন। কারণ তারা পছন্দের রাজনীতিকদের সম্পর্কে জানতে চান। তাদের চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে ধারণা পেতে চান। বাংলাদেশের রাজনীতিকদের মধ্যেও অনেকেই রয়েছেন যারা সাহিত্যমান সম্পন্ন, তথ্যনির্ভর ও উন্নতমানের বই রচনা করেছেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, সত্যেন সেন, আবুল মনসুর, কমরেড আবদুস শহীদসহ অনেক রাজনীতিকের লেখা বই পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছিল।

আমাদের দেশে রাজনীতিকদের মধ্যে অনেক নেতাই লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাদের লেখা শুধু রাজনীতির বিষয়াদির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, স্মৃতিকথা, নাটক, অর্থনীতি, পৌরনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, ইসলাম ধর্ম সবগুলো বিষয় নিয়ে লেখালেখি করেছেন। এমনকি পবিত্র আল কোরআনের তর্জমাও করেছেন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা। প্রশাসন, কারাগার, খেলাধুলা, ভ্রমণ, সিনেমা, নাটক, শিল্পকলা, সবগুলো বিভাগে রয়েছে রাজনীতিকদের পদচারনা। অনেকেই নিজের রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রামের কথা বই আকারে লিখেছেন। অনেকেই কারাগারের স্মৃতিকথা বন্দী জীবনের অভিজ্ঞতা নিজের মতো করে লিখেছেন। কেউ লিখেছেন প্রশাসন পরিচালনার অভিজ্ঞতার কথা। গল্প, কবিতা, নাটক লিখেছেন এমন নেতার সংখ্যাও কম নয়। রাজনৈতিক ধারার বই লিখে দেশের সমসাময়িক ইতিহাসকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন নিজেদের মতোকরে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা গল্পের মাধ্যমে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। 'ওরা টোকাই কেন' নামের গল্পের বই লিখে তিনি বেশ আলোচিত হন। তার লেখা এই বইটি বাংলা একাডেমীর বই মেলায় প্রচুর বিক্রি হয়েছিল। এরপর আরো কয়েকটি বই লিখেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা। তার লেখা সর্বশেষ প্রকাশিত বইয়ের নাম 'লাঞ্ছিত মানবতা'। সাবেক প্রেসিডেন্ট এইচএম এরশাদ কবিতা দিয়ে লেখালেখির জগতে প্রবেশ করেন। 'কনক প্রদীপ জ্বালো' নামের তার লেখা প্রথম কবিতার বই বের হয় আশির দশকে। এরপর তার লেখা আরো ৯টি কবিতার বই প্রকাশিত হয়। এক পৃথিবী আগামী কালের জন্য, নির্বাচিত কবিতা, নবান্নে সুখের ঘ্রাণ, যুদ্ধ এবং অন্যান্য কবিতা,

এরশাদের কবিতা সমগ্র, ইতিহাসের মাটির চেনা চিত্র ও যেখানে বর্ণমালা জ্বলে। এছাড়াও কারাগারের স্মৃতি নিয়ে 'কারাগারের নিঃসঙ্গ দিনগুলো' নামের একটি কবিতার বই লিখেছেন। আমেরিকা যখন ইরাক আক্রমণ করে তখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে তার লেখা বড় আকারের একটি কবিতা ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়েছিল। জামায়াতের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম পবিত্র কোরআনের তর্জমা করেছেন। এছাড়াও অর্ধশতাধিক বই লিখেছেন। লেখালেখিতে বেশী সময় দেয়ার জন্যই নাকি ২০০০ সালে জামায়াতের আমীর পদ থেকে অবসর নিয়েছেন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টামণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মিজানুর রহমান চৌধুরী ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে বিশাল আকৃতির বই লিখেছেন। তার লেখা বইটির নাম দিয়েছেন 'রাজনীতির তিন কাল'। তিনি আরো একটি বই লেখার কাজে হাত দিয়েছেন বলে জানা গেছে। সাবেক উপ-প্রধানমন্ত্রী শাহ্ মোয়াজ্জেম হোসেন কারাগারের স্মৃতি নিয়ে লিখেছেন 'নিত্য কারাগার' নামে একটি বই। বইটি সত্তুর দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলা একাডেমী থেকে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এরপর ঢাউস আকৃতির 'বলেছি বলছি বলব' নামের আরেকটি বই রচনা করেছেন। আওয়ামী লীগের শাসনামলে কারাগারে বসে রচিত তার এই বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। এছাড়াও তিনি আরো ৬টি উপন্যাস লিখেছেন। ডেমোক্রেটিক লীগের সভাপতি অলি আহাদ লিখেছেন জাতীয় রাজনীতি ৪৫ থেকে ৭৫ নামের রাজনৈতিক ধারার একটি বই। বইটির কয়েকটি সংস্করণ বের হয়েছে। ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ একাধিক বই রচনা করেছেন। তার লেখা বই বামধারার রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মীদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। সাবেক মন্ত্রী আনোয়ার জাহিদ 'কালের যাত্রা' নামের একটি বই লিখেছেন। তার লেখা প্রবন্ধের এই বইটি পাঠক মহলে সমাদৃত হয়েছে। দৈনিক ইনকিলাবের উপদেষ্টা আনোয়ার জাহিদ এক সময় সাংবাদিকদের নেতা হিসেবে ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন। আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদও লেখালেখি করেন। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রকাশিত তার লেখা একটি বই লিখে রাজনৈতিক অঙ্গনে ১৯৯৬-৯৭ সালে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠেছিল। সাবেক অর্থমন্ত্রী শাহ্ এ এম এস কিবরিয়া বেশ কয়েকটি বই লিখেছেন। তার লেখার প্রতি পাঠকদের যথেষ্ঠ আগ্রহ রয়েছে। এখন তিনি নিজের সম্পাদিত একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় নিজের জীবনের স্মৃতিকথা লিখছেন। কমিউনিস্ট নেতা সরদার ফজলুল করিম লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার লেখা কয়েকটি বইয়ের মধ্যে 'সেই সে কাল', 'কিছু স্মৃতি কিছু কথা' ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী রফিকুল ইসলাম পিএসসি 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' নামে মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি বই লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন। এছাড়াও তার লেখা আরো কয়েকটি বই রয়েছে। জামায়াতের আমীর ও শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিযামী এক সময় সাংবাদিকতার সাথে যুক্ত ছিলেন। তিনিও ১২টি বই লিখেছেন।

বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেননের লেখা একাধিক বই বাজারে রয়েছে। এখনো তিনি রাজনীতির পাশাপাশি লেখালেখি করছেন। ওয়ার্কার্স পার্টির পলিটবুরোর সদস্য হায়দার আকবর খান রনো বাম ধারার লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। ১৯৬৫ সালে সাম্রাজ্যবাদের রূপরেখা নামের তার লেখা প্রথম বই বের হয়। কিছুদিন আগে তার লেখা রাজনীতির কথা প্রসঙ্গ ও বিধি প্রসঙ্গ নামের দু'টি বই বের হয়েছে। হায়দার আকবর খান রনোর লেখা আরো কয়েকটি বই বাজারে রয়েছে। সাবেক মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল মাল আবদুল মুহিতের লেখা অর্থনীতি বিষয়ক বই বাজারে রয়েছে। কৃষক শ্রমিক জনতা লীগের সভাপতি আবদুল কাদের সিদ্দিকীও লেখক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন। তার লেখা একাধিক বই বাজারে রয়েছে। সাবেক মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী কারাগারের স্মৃতি নিয়ে একটি বই লিখে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক বদরুদ্দোজা চৌধুরীও কয়েকটি বই রচনা করেছেন। প্রেসিডেন্ট থাকাবস্থায় তার বই বাংলা একাডেমীর বই মেলায় প্রচুর বিক্রি হয়েছে।

ইসলামী ঐক্যজোটের চেয়ারম্যান মুফতি ফজলুল হক আমিনী ফাতাওয়ায়ে জামেয়া নামের বিশাল আকৃতির একটি বই লিখেছেন। এছাড়াও ইসলামী ধারা ও ফতোয়ার ওপর তার লেখা আরো ৩টি বই রয়েছে। জামায়াতের নায়েবে আমীর ও ইসলামী চিন্তাবিদ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী নিয়মিত লেখালেখি করেন। ইসলামী ধারার অসংখ্য বই লিখেছেন তিনি। ইসলামী ঐক্যজোটের ভাইস চেয়ারম্যান মুহিউদ্দিন খানও লেখক হিসেবে সুপ্রষ্ঠিত। জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শেখ শওকত হোসেন নিলু 'দেশ ও জনগণের জিয়াউর রহমান' নামের একটি বই রচনা করেছেন। কমরেড নূরুলহক মেহেদী নিয়মিত লেখালেখি করেন। বিএনপির অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের লেখা বই রয়েছে। আনোয়ার হোসেন মঞ্জু ও শেখ ফজলুল

করিম সেলিম এক সময় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। বিএনপির নেতা ও প্রতিমন্ত্রী আলমগীর কবির কবিতা লেখেন দীর্ঘদিন থেকে। এক সময় বরেন্দ্র কথা নামের একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতেন তিনি। তার লেখা ৩টি কবিতা ও ৩টি নাটকের বই রয়েছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রীও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এক সময় সাংবাদিকতা করতেন। তার লেখা বেশ কয়েকটি বই বাজারের রয়েছে। বাংলাদেশের হৃদয় হতে, মেঘে মেঘে অনেক বেলা, তিন সমুদ্দুরের দেশে, এ বিজয়ের মুকুট কোথায় ও পাকিস্তানের কারাগারে বঙ্গবন্ধু ওবায়দুল কাদেরের লেখা বইগুলোর মধ্যে অন্যতম। গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক কিছুদিন আগে একটি দৈনিক পত্রিকায় বিশাল আকৃতির একটি লেখা লিখেছিলেন। আগামীতে তিনি সেই লেখা দিয়ে একটি বই বের করার চিন্তাভাবনা করছেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য কর্নেল (অবঃ) অলি আহমদ একাধিক বই রচনা করেছেন। মন্ত্রী এবং বিএনপির নেতা কর্নেল (অবঃ) আকবর হোসেনও বই লিখেছেন।

সাবেক তথ্য প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক আবু সাইয়িদ একজন লেখক। তার লেখা কয়েকটি বই রয়েছে। ধর্মপ্রতিমন্ত্রী ও বিএনপির নেতা মোশারেফ হোসেন শাহাজান লেখক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার লেখা বই বেশ জনপ্রিয়। শুধু তাই নয়, তার লেখা নাটক বিটিভিতে প্রচারিত হয়েছে। সাবেক প্রতিমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ নেতা আবুল হোসেন বেশ কয়েকটি বই রচনা করেছেন। শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের নেতা নির্মল সেন দীর্ঘদিন সাংবাদিকতা করেছেন। সরকারি মালিকানাধীন একটি দৈনিক পত্রিকায় চাকরির কারণে নিয়মিত লেখালেখি করেছেন। মুসলিম লীগের মহাসচিব জমির আলী এক সময় সাংবাদিকতা করতেন। সাপ্তাহিক ঝরণা নামের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার মালিক-সম্পাদক ছিলেন। বিএনপির মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত একটি পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সরদার আমজাদ হোসেন নিয়মিত লেখালেখি করেন। একই দলের নেতা ফকির আশরাফ বেশ কয়েকটি বই রচনা করেছেন। এখানে তুলে ধরা হলো হাতে গোনা কয়েকজন রাজনীতিবিদের লেখালেখির কথা। এছাড়াও অনেক দেশে রাজনীতিক ব্যক্তিত্ব রয়েছেন যারা লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। রাজনীতির পাশাপাশি তারা নিয়মিত লেখালেখি করছেন। তাদের লেখা কবিতা, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী ও আইন বিষয়ক বই বেশ পাঠক মহলে সমাদৃত হচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া, শেখ হাসিনা ও এইচএম এরশাদকে নিয়ে আরো অসংখ্য বই লেখা হয়েছে। প্রবীন নেতা অলি আহাদকে নিয়েও চীর বিদ্রোহী অলি আহাদ নামে একটি বই সম্পাদনা করেছেন মুন্সি আবদুল মজিদ। রাজনীতিকদের এই লেখালেখি বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে লেখালেখি দেশের বই পাঠক বৃদ্ধিতে যে সহায়তা করেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। রাজনীতিকদের উচিত আরো বেশী বেশী করে লেখায় মনোনিবেশ করা। তাতে করে নতুন প্রজন্ম রাজনীতিকদের সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে।

নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কারের প্রস্তাব

দেশের ৩০ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছিল আজকের বাংলাদেশের জন্য। তাদের জীবন উৎসর্গের লক্ষ্য ছিল, অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করা। দুর্নীতি দুঃশাসনের অবসান করে নির্যাতিত-নিপীড়িত দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানো। কিন্তু বাস্তবে আমাদের স্বাধীনতার লক্ষ্য ও আদর্শ ব্ল্যাকমেইল হয়ে গেছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক মূল্যবোধ, আইন শৃঙ্খলাসহ সর্বত্র ভয়ানক পরিস্থিতির মূলে রয়েছে যোগ্য, দক্ষ, অভিজ্ঞ, সৎ ও আদর্শবান নেতৃত্বের অভাব। নোংরা কলুষিত নেতৃত্বের কারণে আমাদের দেশে অসৎ, অদক্ষ, অযোগ্য, কালো তালিকাভুক্ত মানুষ ও রাজনৈতিক নেতার জন্ম হয়েছে। কালো তালিকাভুক্ত লোকগুলো দেশের সকল ক্ষমতার উৎস ও রাজনীতির নিয়ন্ত্রক। তাই রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি নামক ঘাতক ব্যাধি প্রবেশ করেছে, সৎ আদর্শবান দেশপ্রেমিক মানুষের নেতৃত্বের অবসান ঘটানো হয়েছে। ফলে সমাজে তাদের নেতৃত্ব বিস্তার লাভ করে। তাদের নেতৃত্বে আমরা তৃতীয় বারের মত দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ডিগ্রী অর্জন করেছি। আজকের কালো টাকার মালিক, গডফাদার, সন্ত্রাসী, হাইজ্যাকার, কিলার, ছিনতাইকারী, অপহরণকারী, চোর, ডাকাত, চোরাকারবারী, স্বর্ণ চোরাচালানী, মাদকদ্রব্য ও অস্ত্র ব্যবসায়ী, ভূমিদস্যু, পানিদস্যু, রাষ্ট্রীয়সম্পদ লুণ্ঠনকারী, গণতন্ত্র হরণকারী, আদর্শহীন রাজনৈতিক নেতাদের কালো তালিকাভুক্ত করতেই হবে অসৎ মানুষের উর্বর

পেশা বন্ধের লক্ষ্যে প্রচলিত বৃটিশ আইনে অপরাধীদের কঠোর হস্তে দমন করা সম্ভব নয়। কারণ দুইশ' বছর আগে মানুষের ধ্যান-ধারণা, অপরাধ প্রবণতার কৌশল আর আজকের মানুষের ধ্যানধারণা, অপরাধপ্রবণতার কৌশল এক নয়। বিধায় বৃটিশের ঘুণে ধরা আইনদ্বারা আজকের অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণ করা যায় না। কাজেই অল্প সময়ের মধ্যে অপরাধ প্রমাণের জন্য নিরপেক্ষ যুগোপযোগী আইনের প্রয়োজন। আমরা দল, মত, নির্বিশেষে সবাই বলি সন্ত্রাস, দুর্নীতি নির্মূল হোক। নির্বাচনের সময় সকল রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাস, দুর্নীতি-নির্মূলের কথা বলে থাকে। কিন্তু ক্ষমতায় এসে সন্ত্রাস-দুর্নীতি লালনপালন তারাই করে। আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলগুলো সন্ত্রাস-দুর্নীতি নির্মূলের লক্ষ্যে নিজ দলের সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজদের তালিকা যদি প্রকাশ করত। তাদের যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচারের কাঠগড়ায় সোপর্দ করা হতো, তাদেরকে যদি প্রশয় না দেয়া হতো; তাহলে আমাদের দেশে সন্ত্রাসী ও দুর্নীতিবাজ থাকতে পারত না। বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাধানের পথ জনগণকেই বের করতে হবে। সর্বস্তরের জনগণ ও নির্বাচনী নীতি নির্ধারকদেরকে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ নিতে হবে। যাতে কালো তালিকাভুক্ত লোকগুলো দেশের ভোটার হতে না পারে। ভোটার হলেও নির্বাচনে প্রার্থী হতে না পারে। নির্বাচনী দায়িত্ব পালন করতে পারবে না। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। এটা হলে ভোট কেন্দ্র দখল করে, ভোটারদের ভয়-ভীতি ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষ হয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমর্থন, স্লোগান, আলোচনা ও সমালোচনা করতে পারবে না। ভোটের দিন নির্বাচনের কেন্দ্র হতে দুই মাইলের মধ্যে তাদের অবস্থান নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। উক্ত তালিকাভুক্ত পরিবারের সদস্যরা দেশের কোন সরকারী চাকরিতে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। যে রাজনৈতিক দল নির্বাচনে যে আসনে কালো তালিকাভুক্তদের ব্যবহার করবে, দুর্নীতির আশ্রয় নেবে, সে দলের সে আসনের রাজনীতি ১০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করবে নমিনেশন বোর্ড। সে লক্ষ্যে আইন পাস করতে হবে। নীতি নির্ধারকদের আরও পদক্ষেপ নিতে হবে। সৎ, আদর্শবান, যোগ্য, দেশপ্রেমিক লোককে নির্বাচনে অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করতে হবে। তাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের আসনে বসাতে হবে। রাজনৈতিক নেতাদের যোগ্যতা নিরূপণ আইন পাস করতে হবে। নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী বাংলাদেশের প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হতে হবে। নির্বাচনের পূর্বে নিজ স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব দিতে হবে। দশ বছর অতীতের জনকল্যাণকর কাজসহ খুব ভাল রিপোর্ট থাকতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হতে হবে। নিজ আসনে আইন-শৃঙ্খলা উন্নয়নসহ সর্ববিষয়ে জনগণের কাছে জবাবদিহিতা থাকতে হবে। উপরোক্ত বিষয়গুলো যাচাই-বাছাই করে দলীয় প্রধানরা প্রতি আসনে দুইজন করে সিলেকশন করবেন। যাতে কালোতালিকাভুক্ত ও যোগ্যতাহীন কোন লোক নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না পারে। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি দশজন সৎ, আদর্শবান বিচারপতি নিয়ে নমিনেশন বোর্ড গঠন করবেন। উক্ত নমিনেশন বোর্ড দলীয় প্রধান কর্তৃক সিলেকশনকৃত ব্যক্তিদেরকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যাচাই-বাছাই করে প্রতি দল হতে একজন করে নমিনেশন প্রদান করবেন। সকল দলে নমিশেন প্রাপ্ত ব্যক্তিরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। দেশ পরিচালনা কে করবেন? জনগণ ভোটের মাধ্যমে তা নির্ধারণ করবেন। উক্ত প্রক্রিয়ায় সর্বস্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে দেশ পরিচালনায় ভাল মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। দেশ ভাল চলবে, সন্ত্রাস, দুর্নীতি কমবে, অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে। সন্ত্রাস ও দুর্নীতির রাজনীতি বিলুপ্ত হবে। দেশ দুর্নীতির অভিশাপ হতে মুক্তি পাবে। এটা আমার প্রস্তাব

মোঃ বাহালুল কবির

অবঃ ফ্লাইট সার্জেন্ট

পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা।

বুড়োয় বুড়োয় লড়াই

আওয়ামী লীগের দুই প্রবীণ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ আর সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের মধ্যে লড়াই চলছে। গণতন্ত্রী পার্টি থেকে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত আওয়ামী লীগে যোগদানের পর থেকেই দুই নেতার মধ্যে চলছে এই লড়াই। সুনামগঞ্জ জেলার দলীয় রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অসংখ্য বার দুই নেতা একে অপরকে অবাঞ্ছিত

ঘোষণা করেছেন। একে অন্যের বিরুদ্ধে লাঠি মিছিল, ঝাড় মিছিল, এমনকি জুতা মিছিল পর্যন্ত করেছে। দুই প্রবীণ নেতা একে অন্যের সম্পর্কে যেভাবে অশ্লীল অরুচিকর শব্দের ব্যবহার করেন তা পত্রিকায় লেখাও যায় না। দলের সভানেত্রী শেখ হাসিনা অনেকবার দুই নেতাকে নিয়ে বসেছেন। সমঝোতার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কোন কাজ হয়নি।

ইদানীং দুই নেতা আবার কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছেন। একে অন্যের সঙ্গে স্বাভাবিক কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছেন। দলের পক্ষ থেকে দুই নেতার এই কোন্দল নিরসনের উদোগ নেয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় নেতারা বলেছেন বুড়োয় বুড়োয় লড়াই বন্ধ করা সম্ভব নয়। কারণ তারা বয়সে বুড়ো হলেও সাংগঠনিক কাজকর্মে এখনো উদ্যমী। লড়াই তারা ভাল বাসেন।

যে যা বলছে

☞ সন্ত্রাসীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে ঃ খালেদা জিয়া

☞ ইসলাম কখনোই সন্ত্রাসকে সমর্থন করে না ঃ সেমিনারে বক্তারা

☞ গ্রেনেড হামলার জন্য সরকার দায়ী ঃ শেখ হাসিনা

☞ রাজনৈতিক দলের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার নিন্দার কোনো ভাষা নেই ঃ এরশাদ

☞ শেখ মুজিবের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়ানোর আ'লীগের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে ঃ মান্নান ভূঁইয়া

☞ বিএনপির রাজনীতির মূল লক্ষ্য তিনটি ঃ তারেক রহমান সরকার উন্মাদের মত আচরণ করছেন আবদুল জলিল

☞ দেশকে ভয়াবহ পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে ঃ আমিনী